গোঘ্ন শব্দের অর্থ কী? সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তার গল্পের এই নাম রাখলেন কেন? কাহিনি বিশ্লেষন করে পর্যালোচনা করো

বৌদ্ধ যুগের পূর্বে অতিথিকে গো মাংস খাওয়ানো হত, তাই অতিথির আরেক নাম গোঘ্ন। শব্দটি সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'গোঘ্ন' গল্পে অনন্য মাত্রা ফুটিয়ে তুলেছে। বাংলা সাহিত্যে গরুকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি গল্প রচিত হয়েছে। যেমন- শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', হাসান আজিজুল হকের 'আমৃত্যু আজীবন', আবদুল আজীজ আল্-আমানের 'আত্মজা', নাজিব ওয়াদুদের 'কসাই' প্রভৃতি। তার পরেও একথা বলা যায় যে, আন্তরিকতা ও সমানুভূতির সঙ্গে আত্মগ্লানির পরিনতি চিত্রণে 'গোঘ্ন' শব্দের তাৎপর্যময় উপস্থাপন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

গল্পটির বিষয়গত উপস্থাপন কৌশলেই নামকরণটি তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। যা আমরা কয়েকটি পর্বে বিশ্লেষন করতে পারি। গল্পের শুরু হয়েছে এভাবে—' চারু মাস্টারের বেহালা শুনে দোলাই বড়ো কেঁদেছিল'। মোদিপুরের দোলাই, যে মাস্টারের বেহালা শুনে কাঁদে, যে দারিদ্রের বাঁধন কাটিয়ে স্নেহের আতিশয্যে দু-বস্তা কলাই ও কুড়িটা কুমড়ো দেওয়ার কথা বলতে পারে মাস্টারের মেয়ের বিয়েতে সে এখন গাবতলার মাটি পেরিয়ে পরপারে। কথা রেখেছিল ভাই হারাই। মৃত ভাইয়ের ইচ্ছে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছে পূরণের পথে গিয়ে রুঢ় জীবনের যে রূপ দেখেছে তা আমরা কেবল গল্পকারের ভাষাতেই প্রকাশ করতে পারি— 'আবছা আলো-অন্ধকারে একটা লোক জবাইকরা প্রাণীর মতো ধড়ফড় করছে।' কেন এই পরিণতি ? কেন আলো-অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে হারাই? এই কেনোর উত্তর আমাদের পৌঁছে দেয় 'গোঘ্ন' গল্পের নামকরণের খোঁজে।

আমরা গল্পে দেখতে পাই গরুর প্রতি হারাইয়ের আন্তরিকতার চিত্র। মাস্টারের বাড়িতে গরু অসুস্থ হয়ে পড়লে হারাই পথ চলতে গিয়ে ডাক্তার দেখায়। তারপরও গরু যখন উঠছে না তখন হারাই বলে—'বাপ, ধনারে,...কষ্ট করে এট্টু গা তোল বাছা! বদ্যির ওষুধ খেয়েছিস আর ভয় কিসের? ওরে ব্যেটা না না! ভাবছিস তোকে গাড়ি টানাবো ফির (ফের) ? হামি কি লিদয়া মানুষ? সোনা হামার, ওঠ্ দিকিনি!' বাস্তবিকই হারাই গরুকে মুক্ত করে গরু গাড়ির জোয়ালকে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। জানোয়ার পায় মানুষের ভালোবাসা আর জানোয়ারের কাজ করে মানুষ। তবুও শেষ রক্ষা হয় না। গরু ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। দিলজান কষাই এর পরোচনা উপেক্ষা করে, শেষ আশ্রয় হিসেবে পার্থনা করে সৃষ্টি কর্তার কাছে—'হামার বেটার জান মাগি হুজুর...হেই পরোয়ারদিগার! হামরা মাগ-মরদে বাঁজা লই তুমার মেহেরবানিতে। তুমি এক বেটার জানের বদলে হামারঘে আরেক ব্যাটার হায়াত দাও।' নিজের ছেলের প্রাণের বিনিময়ে যে ভালোবাসার সন্তানকে সে রক্ষা করার পার্থনা করেছিল হারাই, সে পার্থনা পূরণ হয়নি। বরং দেখতে পাই কষাই দিলজানের উদ্দেশ্য সফল হয়। মুমূর্ষু গরুর বিনিময়ে দিলজান যখন তিরিশ টাকা হাতের মুঠোয় ভরে দেয়, তখন হাট ভর্তি মানুষের দিলজানপন্থি উপদেশ উপেক্ষা করার সামর্থ হারিয়ে ফেলেছিল হারাই। এর পরের পর্বেই গল্পের নতুন মোড় দেখা যায়।

Download Free Notes From www.banglasahitya.in

দয়ালু হাজি সাহেব এসে সান্তনা দেয়, নিজের বাড়িতে ডেকে আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে হারাইয়ের। এত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে খেতে বসার আনন্দে যখন হারাইয়ের বুক ফুলে ওঠে, মাংসের টুকরো যখন মুখে তুলে নেয়; তখন হাজিসাহেব জানায়—' আমার ভাগ্নেব্যাটা একেবারে গো-খাদ (খাদক) আজ হাটবার ছিল। দিলজান একটা হালাল করেছে শুনে নিয়ে এসেছিল।' তখন হারাই আর নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনা। নিজের ছেলের থেকে যাকে ভালোবাসে তার মাংস খাচ্ছে হারাই। সৃষ্টিকর্তার এই খেলায় হারাই হেরে গিয়েছে। তাই জবাইকরা প্রানীর মতো হারাই ছটপট করতে থাকে। আর?

ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিল হারাই। গাঁয়ে মুসলিম থাকলে চারু মাস্টারের বাড়িতে ভাত খায় না। সময় হলে পথের প্রান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ে নামাজের উদ্দেশে। সেই ধর্ম যখন বলছে গরু-মাংস খাওয়া হালাল, অথচ হাজি সাহেবের বাড়িতে মাংস খেয়ে হারাই বলে ওঠে— 'হেই হাজিসাব! হামাকে হারাম খাওয়ালেন!' আসলে ধর্মের প্রেক্ষিত পেরিয়ে যখন জীবনের চোরাগলির সুর ধ্বনিত হয়, তখন পরম জীবনের চরম রহস্যময়তায় শিল্পীর তুলির ছোঁয়া আমাদের তপ্ত হৃদয়ে কোনো এক অজানা আবেশ রেখে যায়। এই নক্ষত্রভরা আবেশের আকাশে ধরা দেয় হারাই এর স্ত্রী-সন্তান। আর এভাবেই এসে দাঁড়ায় একদিকে মৃত্যু যন্ত্রনা, অন্যদিকে ভালোবাসার অবিমিশ্র আশ্রয়স্থল। এই বৈপরীত্যের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে — সন্তান তুল্য গোরুর মাংস খাওয়া। আর এখানেই 'গোঘ্ন' নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

Download Free Notes From www.banglasahitya.in